কি ঘটেছিল কারবালায়? কারা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করেছে?

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2014 - 1436

IslamHouse.com

﴿ماذا حدث في كربلاء؟ ومن الذي قتل الحسين رضي الله عنه؟﴾

« باللغة البنغالية »

عبد الله شاهد المدني

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2014 - 1436

IslamHouse.com

কি ঘটেছিল কারবালায়? কারা হুসাইন রাদিয়াল্লাহ আনহুকে হত্যা করেছে?

এই প্রবন্ধে যে সকল বিষয় আলোচিত হয়েছে সেগুলো হল:

১) ভূমিকা

২) কারবালার প্রান্তরে রাসূলের দৌহিত্র হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু নিহত হওয়ার প্রকৃত ঘটনা।

৩) ফুরাত নদীর পানি পান করা থেকে বিরত রাখার কিচ্ছা।

৪) কারবালার প্রান্তরে হুসাইনের সাথে আরও যারা নিহত হয়েছেন।

৫) কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ধারণা ঠিক নয়।

৬) হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বের হওয়া ন্যায়সংগত ছিল কি?

৭) কারবালার ঘটনাকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করব?

৮) মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করার ক্ষেত্রে শিয়া মাজহাবের মতামত।

৯) আশুরার দিনে আমাদের করণীয় কী?

১০) শিয়াদের বর্ণনায় আশুরার রোযা।

১১) আশুরার দিনে মাতম করার ভিত্তি কোথায়?

১২) হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হত্যায় ইয়াযীদ কতটুকু দায়ী?

১৩) তাহলে কে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করল?

১৪) হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হত্যাকারী নির্ধারণে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত।

১৫) হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাষণই প্রমাণ করে যে ইয়াযীদ তাঁর হত্যার জন্য সরাসরি দায়ী নয়।

১৬) আলী ইবন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পিতা হুসাইনকে হত্যার জন্য কুফাবাসীদেরকে দায়ী করেছেন?

১৭) হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাথা কোথায় গিয়েছিল?

১৮) যেমন কর্ম তেমন ফল।

১৯) ইয়াযীদ সম্পর্কে একজন মুসলিমের ধারণা কেমন হওয়া উচিত।

২০) উপসংহার।

১) ভূমিকা:

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁর পরিবার এবং সকল সাহাবীর উপর।

সৌভাগ্যবান শহীদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র সায়্যেদ হুসাইন ইবন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কারবালার প্রান্তরে শহীদ হওয়াকে কেন্দ্র করে অনেক ঘটনাই প্রসিদ্ধ রয়েছে। আমাদের বাংলাদেশের অনেক মুসলিমের মধ্যে এ বিষয়ে বিরাট বিভ্রান্তি রয়েছে। দেশের রাষ্ট্রপ্রতি, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতাগণ, ইসলামী বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ এ দিন উপলক্ষে জাতির সামনে প্রতিবছর বিশেষ বাণী তুলে ধরেন। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র এ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে থাকে। এ দিন আমাদের দেশে সরকারী ছুটি থাকে। তাদের সকলের কথা ঘুরে ফিরে একটাই। স্বৈরাচারী, জালেম, নিষ্ঠুর ও নরপশু ইয়াযীদের হাতে এ দিনে রাসূলের দৌহিত্র ইমাম হুসাইন নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। এ জন্য এটি একটি পবিত্র দিন। বিশেষ একটি

সম্প্রদায় এ দিন উপলক্ষে তাজিয়া মিছিলসহ নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। বিষাদসিন্ধু নামক একটি উপন্যাস পড়ে বা এর কিছু বানোয়াট ও কাল্পনিক কাহিনী শুনে সুন্নি মুসলিমগণও এ বিষয়ে ধুম্রজালে আটকা পড়েছেন।

জাতির ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য আজ আমি এ বিষয়ে সঠিক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য প্রকাশ করার কাজে অগ্রসর হতে বাধ্য হলাম। মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি ভূমিকা পেশ করতে চাই। মন দিয়ে ভূমিকাটি পড়লে মূল বিষয় বুঝতে সহজ হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি আরও বিশ্বাস করি যে, আমার লেখাটি পড়ে এ বিষয়ে অনেকের আকীদাহ সংশোধন হবে। আর যারা বিষয়টি নিয়ে সংশয়ে আছেন, তাদেরও সংশয় কেটে যাবে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম ইবনে কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন: প্রতিটি মুসলিমের উচিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র সায়্যেদ হুসাইন ইবন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর কারবালার প্রান্তরে শহীদ হওয়ার ঘটনায় ব্যথিত হওয়া ও সমবেদনা প্রকাশ করা। তিনি ছিলেন মুসলিম জাতির নেতা ও ইমামদের অন্যতম। রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশ্রেষ্ঠ কন্যা ফাতেমার পুত্র ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন বিজ্ঞ সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন একধারে ইবাদাতগুজার, দানবীর এবং অত্যন্ত সাহসী বীর। হাসান ও হুসাইনের ফযীলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। অন্তর দিয়ে তাদেরকে ভালবাসা ঈমানের অন্যতম আলামত এবং নবী পরিবারের কোনো সদস্যকে ঘৃণা করা ও গালি দেওয়া মুনাফেকির সুস্পষ্ট লক্ষণ। যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত কেবল তারাই ইমাম হুসাইন বা নবী পরিবারের পবিত্র সদস্যদেরকে ঘৃণা করতে পারে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ অনুযায়ী ইমাম হুসাইন বা অন্য কারও মৃত্যুতে মাতম করা জায়েয নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল মুসলিম জাতির বিরাট একটি গোষ্ঠী ইমাম হুসাইনের মৃত্যুতে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে থাকে। যারা হুসাইনের মৃত্যু ও কারবালার ঘটনা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন, তাদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করা খুবই যুক্তিসংগত মনে করছি। যে সমস্ত সুন্নি মুসলিম সঠিক তথ্য না জানার কারণে এ ব্যাপারে সন্দিহান ও বিভ্রান্তিতে আছেন

তাদের কাছেও আমার একই প্রশ্ন। প্রশ্নগুলো ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারলেই প্রকৃত ঘটনা বুঝা খুব সহজ হবে ইনশা-আল্লাহ।

প্রথম প্রশ্ন: হুসাইনের পিতা এবং ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী ইবন আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু হুসাইনের চেয়ে অধিক উত্তম ছিলেন। তিনি ৪০ হিজরী সালে রমযান মাসের ১৭ তারিখ জুমার দিন ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় আব্দুর রহমান ইবন মুলজিম খারেজীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। তারা হুসাইনের মৃত্যু উদযাপনের ন্যায় তাঁর পিতার মৃত্যু উপলক্ষে মাতম করে না কেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন: আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ অনুযায়ী উসমান ইবন আফফান ছিলেন আলী ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে অধিক উত্তম। তিনি ৩৬ হিজরী সালে যুলহজ্জ মাসের আইয়ামে তাশরীকে স্বীয় বাসভবনে অবরুদ্ধ অবস্থায় মাযলুমভাবে নিহত হন। ন্যায় পরায়ণ এই খলীফাকে পশুর ন্যায় জবাই করা হয়েছে। তারা তাঁর হত্যা দিবসকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান করে না কেন?

তৃতীয় প্রশ্ন: এমনভাবে খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, উসমান এবং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকেও উত্তম ছিলেন। তিনি ফজরের নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন এবং মুসলিমদেরকে নিয়ে জামা'আতের ইমামতি করছিলেন। এমন অবস্থায় আবু লুলু নামক একজন অগ্নিপূজক তাঁকে দুই দিকে ধারালো একটি ছুরি দিয়ে আঘাত করে। সাথে সাথে তিনি ধরাশায়ী হয়ে যান এবং শহীদ হন। লোকেরা সেই দিনে মাতম করে না কেন?

চতুর্থ প্রশ্ন: ইসলামের প্রথম খলীফা এবং রাসূলের বিপদের দিনের সাথী আবু বকরের মৃত্যু কি মুসলিমদের জন্য বেদনাদায়ক নয়? তিনি কি রাসূলের পরে এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন না? তার মৃত্যু দিবসে তারা তাজিয়া করে না কেন?

পঞ্চম প্রশ্ন: সর্বোপরি নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া ও আখেরাতে সমস্ত বনী আদমের সরদার। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অন্যান্য নবীদের ন্যায় স্বীয় সান্নিধ্যে উঠিয়ে নিয়েছেন। সাহাবীদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর চেয়ে অধিক বড় আর কোনো মুসীবত ছিল না। তিনি ছিলেন

তাদের কাছে স্বীয় জীবন, সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের চেয়েও অধিক প্রিয়। তারপরও তাদের কেউ রাসূলের মৃত্যুতে মাতম করেন নি। হুসাইনের প্রেমে মাতালগণকে রাসূলের মৃত্যু দিবসকে উৎসব ও শোক প্রকাশের দিন হিসেবে নির্ধারণ করতে দেখা যায় না কেন?

ষষ্ঠ প্রশ্ন: সর্বশেষ প্রশ্ন হচ্ছে হুসাইনের চেয়ে বহুগুণ বেশী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মৃত্যু দিবসকে বাদ দিয়ে ইমাম হুসাইনের মৃত্যুকে বেছে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি শুরু করা হল কেন? এর উত্তর আমার এই লেখার শেষ পর্যায়ে উল্লেখ করেছি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লেখাটি পাঠ করলে উত্তরটি সহজেই বোধগম্য হওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ সর্বোপরি ইসলামে কারও জন্ম দিবস বা মৃত্যু দিবস পালন করার এবং কারও মৃত্যুতে মাতম করা, উচ্চ স্বরে বিলাপ করা এবং অন্য কোনো প্রকার অনুষ্ঠান করার কোনো ভিত্তি নেই। শুধু তাই নয় এটি একটি জঘন্য বিদআত, যা পরিত্যাগ করা জরুরী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর কোনো সাহাবী কারও জন্ম দিবস বা মৃত্যু দিবস পালন করেন নি।

২) কারবালার প্রান্তরে রাসূলের দৌহিত্র হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু নিহত হওয়ার প্রকৃত ঘটনা:

৬০ হিজরিতে ইরাকবাসীদের নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াযীদ ইবন মু'আওয়িয়া হাতে বাই'আত করেন নি। তারা তাঁর নিকট চিঠি-পত্র পাঠিয়ে জানিয়ে দিল যে ইরাকবাসীরা তাঁর হাতে খেলাফতের বাই'আত করতে আগ্রহী। ইয়াযীদকে তারা সমর্থন করেন না বলেও সাফ জানিয়ে দিল। তারা আরও বলল যে, ইরাকবাসীরা ইয়াযীদের পিতা মু'আওয়িয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিও মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। চিঠির পর চিঠি আসতে লাগল। এভাবে পাঁচ শতাধিক চিঠি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে এসে জমা হল।

প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার জন্য হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম ইবন আকীলকে পাঠালেন। মুসলিম কুফায় গিয়ে পৌঁছলেন। গিয়ে দেখলেন, আসলেই লোকেরা হুসাইনকে চাচ্ছে। লোকেরা মুসলিমের হাতেই হুসাইনের পক্ষে বাই'আত নেওয়া শুরু করল। হানী ইবন 'উরওয়ার ঘরে বাই'আত সম্পন্ন হল।

সিরিয়াতে ইয়াযীদের নিকট এই খবর পৌঁছা মাত্র বসরার গভর্নর উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য পাঠালেন। ইয়াযীদ উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদকে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেন কুফাবাসীকে তার বিরুদ্ধে হুসাইনের সাথে যোগ দিয়ে বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেন। সে হুসাইনকে হত্যা করার আদেশ দেন নি।

উবাইদুল্লাহ কুফায় গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি বিষয়টি তদন্ত করতে লাগলেন এবং মানুষকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন। পরিশেষে তিনি নিশ্চিত হলেন যে, হানী ইবন ‘উরওয়ার ঘরে হুসাইনের পক্ষে বাই‘আত নেওয়া হচ্ছে।

অতঃপর মুসলিম ইবন আকীল চার হাজার সমর্থক নিয়ে অগ্রসর হয়ে দ্বিপ্রহরের সময় উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের প্রাসাদ ঘেরাও করলেন। এ সময় উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদ দাঁড়িয়ে এক ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি ইয়াযীদের সেনাবাহিনীর ভয় দেখালেন। তিনি এমন ভীতি প্রদর্শন করলেন যে, লোকেরা ইয়াযীদের ধরপাকড় এবং শাস্তির ভয়ে আস্তে আস্তে পলায়ন করতে শুরু করল। ইয়াযীদের ভয়ে কুফাবাসীদের পলায়ন ও বিশ্বাস ঘাতকতার লোমহর্ষক ঘটনা

জানতে চাইলে পাঠকদের প্রতি ইমাম ইবনে তাইমীয়া রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত 'মিনহাজুস সুন্নাহ' বইটি পড়ার অনুরোধ রইল। যাই হোক, কুফাবাসীদের চার হাজার লোক পালাতে পালাতে এক পর্যায়ে মুসলিম ইবন আকীলের সাথে মাত্র তিন জন লোক অবশিষ্ট রইল। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর মুসলিম ইবন আকীল দেখলেন, হুসাইন প্রেমিক আল্লাহর একজন বান্দাও তার সাথে অবশিষ্ট নেই। এবার তাকে গ্রেপ্তার করা হল। উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদ তাকে হত্যার আদেশ দিলেন। মুসলিম ইবন আকীল উবাইদুল্লাহর নিকট আবেদন করলেন, তাকে যেন হুসাইনের নিকট একটি চিঠি পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হয়। এতে উবাইদুল্লাহ রাজী হলেন। চিঠির সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ছিল এ রকম:
"হুসাইন! পরিবার-পরিজন নিয়ে ফেরত যাও। কুফাবাসীদের ধোঁকায় পড়ো না। কেননা তারা তোমার সাথে মিথ্যা বলেছে। আমার সাথেও তারা সত্য বলে নি। আমার দেওয়া এই তথ্য মিথ্যা নয়।"

অতঃপর যুলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ আরাফা দিবসে উবাইদুল্লাহ মুসলিমকে হত্যার আদেশ প্রদান করেন। এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, মুসলিম ইবন 'আকীল ইতোপূর্বে কুফাবাসীদের

ওয়াদার উপর ভিত্তি করে হুসাইনকে আগমনের জন্য চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠির উপর ভিত্তি করে যুলহাজ্জ মাসের ৮ তারিখে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিলেন। অনেক সাহাবী তাঁকে বের হতে নিষেধ করেছিলেন। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আব্দুল্লাহ ইবন আমর এবং তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফীয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইবনে উমর হুসাইনকে লক্ষ্য করে বলেন: হুসাইন! আমি তোমাকে একটি হাদীছ শুনাবো। জিবরীল আলাইহিস সালাম আগমন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়া এবং আখিরাত- এ দুটি থেকে যে কোনো একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি দুনিয়া বাদ দিয়ে আখিরাতকে বেছে নিয়েছেন। আর তুমি তাঁর অংশ। আল্লাহর শপথ! তোমাদের কেউ কখনই দুনিয়ার সম্পদ লাভে সক্ষম হবেন না। তোমাদের ভালোর জন্যই আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে ফিরিয়ে রেখেছেন। হুসাইন তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং যাত্রা বাদ দিতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর ইবনে উমর হুসাইনের সাথে আলিঙ্গন করে বিদায় দিলেন

এবং ক্রন্দন করলেন। সুফীয়ান ছাওরী ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হুসাইনকে বলেছেন: মানুষের দোষারোপের ভয় না থাকলে আমি তোমার ঘাড়ে ধরে বিরত রাখতাম।

বের হওয়ার সময় আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু হুসাইনকে বলেছেন: হোসাইন! কোথায় যাও? এমন লোকদের কাছে, যারা তোমার পিতাকে হত্যা করেছে এবং তোমার ভাইকে আঘাত করেছে?

আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: হুসাইন তাঁর জন্য নির্ধারিত ফয়সালার দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছেন। আল্লাহর শপথ! তাঁর বের হওয়ার সময় আমি যদি উপস্থিত থাকতাম, তাহলে কখনই তাকে যেতে দিতাম না। তবে বল প্রয়োগ করে আমাকে পরাজিত করলে সে কথা ভিন্ন। (ইয়াহ্-ইয়া ইবনে মাঈন সহীস সূত্রে বর্ণনা করেছেন)

যাত্রা পথে হুসাইনের কাছে মুসলিমের সেই চিঠি এসে পৌঁছল। চিঠির বিষয় অবগত হয়ে তিনি কুফার পথ পরিহার করে ইয়াযীদের কাছে যাওয়ার জন্য সিরিয়ার পথে অগ্রসর হতে থাকলেন। পথিমধ্যে ইয়াযীদের সৈন্যরা ‘আমর ইবন সা‘দ, শামির ইবন যুল জাওশান এবং হুসাইন ইবন তামীমের নেতৃত্বে কারবালার প্রান্তরে হুসাইনের গতিরোধ করল। হুসাইন সেখানে অবতরণ করে আল্লাহর দোহাই দিয়ে এবং ইসলামের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনটি প্রস্তাবের যে কোনো একটি প্রস্তাব মেনে নেওয়ার আহবান জানালেন।

হুসাইন ইবন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং রাসূলের দৌহিত্রকে ইয়াযীদের দরবারে যেতে দেওয়া হোক। তিনি সেখানে গিয়ে ইয়াযীদের হাতে বাই‘আত গ্রহণ করবেন। কেননা তিনি জানতেন যে, ইয়াযীদ তাঁকে হত্যা করতে চান না। অথবা তাঁকে মদিনায় ফেরত যেতে দেওয়া হোক। অথবা তাঁকে কোনো ইসলামী অঞ্চলের সীমান্তের দিকে চলে যেতে দেওয়া হোক। সেখানে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত বসবাস করবেন এবং রাজ্যের সীমানা পাহারা দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। (ইবনে জারীর হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন) ইয়াযীদের সৈন্যরা কোনো প্রস্তাবই মানতে রাজী হল না। তারা

বলল: উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদ যেই ফয়সালা দিবেন আমরা তা ব্যতীত অন্য কোনো প্রস্তাব মানতে রাজী নই। এই কথা শুনে উবাইদুল্লাহর এক সেনাপতি (হুর ইবন ইয়াযীদ) বললেন: এরা তোমাদের কাছে যেই প্রস্তাব পেশ করছে তা কি তোমরা মানবে না? আল্লাহর কসম! তুর্কী এবং দায়লামের লোকেরাও যদি তোমাদের কাছে এই প্রার্থনাটি করত, তাহলে তা ফেরত দেওয়া তোমাদের জন্য বৈধ হত না। এরপরও তারা উবাইদুল্লাহর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতেই দৃঢ়তা প্রদর্শন করল। সেই সেনাপতি ঘোড়া নিয়ে সেখান থেকে চলে আসলেন এবং হুসাইন ও তাঁর সাথীদের দিকে গমন করলেন। হুসাইনের সাথীগণ ভাবলেন: তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসছেন। তিনি কাছে গিয়ে সালাম দিলেন। অতঃপর সেখান থেকে ফিরে এসে উবাইদুল্লাহর সৈনিকদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদের দুইজনকে হত্যা করলেন। অতঃপর তিনিও নিহত হলেন। (ইবনে জারীর হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন)

সৈন্য সংখ্যার দিক থেকে হুসাইনের সাথী ও ইয়াযীদের সৈনিকদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান ছিল। হুসাইনের সামনেই তাঁর সকল সাথী বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে নিহত হলেন। অবশেষে তিনি ছাড়া আর

কেউ জীবিত রইলেন না। তিনি ছিলেন সিংহের মত সাহসী বীর। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের মুকাবিলায় তার পক্ষে ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব হল না। কুফাবাসী প্রতিটি সৈনিকের কামনা ছিল সে ছাড়া অন্য কেউ হুসাইনকে হত্যা করে ফেলুক। যাতে তার হাত রাসূলের দৌহিত্রের রক্তে রঙ্গিন না হয়। পরিশেষে নিকৃষ্ট এক ব্যক্তি হুসাইনকে হত্যার জন্য উদ্যত হয়। তার নাম ছিল শামির ইবন যুল জাওশান। সে বর্শা দিয়ে হুসাইনের শরীরে আঘাত করে ধরাশায়ী করে ফেলল। অতঃপর ইয়াযীদ বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে তিনি শাহাদাত অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন। বলা হয় এই শামিরই হুসাইনের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। কেউ কেই বলেন: সিনান ইবন আনাস আন্ নাখঈ নামক এক ব্যক্তি তাঁর মাথা দেহ থেকে আলাদা করে। আল্লাহই ভাল জানেন।

৩) ফুরাত নদীর পানি পান করা থেকে বিরত রাখার কিচ্ছা:

বেশ কিছু গ্রন্থ তাকে ফুরাত নদীর পানি পান করা থেকে বিরত রাখার ঘটনা বর্ণনা করে থাকে। আর বলা হয় যে, তিনি পানির পিপাসায় মারা যান। এ ছাড়াও আরও অনেক কথা বলে মানুষকে

আবেগময় করে যুগে যুগে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে এবং মূল সত্যটি উপলব্ধি করতে তাদেরকে বিরত রাখার হীন ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এ সব কাল্পনিক গল্পের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। ঘটনার যতটুকু সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে আমাদের জন্য ততটুকুই যথেষ্ট। কোনো সন্দেহ নেই যে, কারবালার প্রান্তরে হুসাইন নিহত হওয়ার ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ধ্বংস হোক হুসাইনের হত্যাকারীগণ! ধ্বংস হোক হুসাইনের হত্যায় সহযোগীরা! আল্লাহর ক্রোধ তাদেরকে ঘেরাও করুক। আল্লাহ্ তা‘আলা রাসূলের দৌহিত্র শহীদ হুসাইন এবং তাঁর সাথীদেরকে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রহমত ও সন্তুষ্টি দ্বারা আচ্ছাদিত করুক।

৪) কারবালার প্রান্তরে হুসাইনের সাথে আরও যারা নিহত হয়েছেন:

- আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সন্তানদের মধ্যে থেকে আবু বকর, মুহাম্মাদ, উসমান, জাফর এবং আব্বাস।

- হুসাইনের সন্তানদের মধ্যে হতে আবু বকর, উমর, উসমান, আলী আকবার এবং আব্দুল্লাহ।

• হাসানের সন্তানদের মধ্যে হতে আবু বকর, উমর, আব্দুল্লাহ এবং কাসেম।

• আকীলের সন্তানদের মধ্যে হতে জাফর, আব্দুর রাহমান এবং আব্দুল্লাহ ইবন মুসলিম ইবন আকীল।

• আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফরের সন্তানদের মধ্যে হতে 'আউন এবং আব্দুল্লাহ। ইতোপূর্বে উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের নির্দেশে মুসলিম ইবন আকীলকে হত্যা করা হয়। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন। আমীন

৫) কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ধারণা ঠিক নয়: হুসাইন ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুতে আকাশ থেকে রক্তের বৃষ্টি হওয়া, সেখানের কোনো পাথর উঠালেই তার নীচ থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়া এবং কোনো উট জবাই করলেই তা রক্তে পরিণত হয়ে যাওয়ার ধারণা মিথ্যা ও বানোয়াট। মুসলিমদের আবেগ ও অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলে তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এ সমস্ত বানোয়াট ঘটনা বলা হয়ে থাকে। এগুলোর কোনো সহীহ সনদ নেই।

ইমাম ইবনে কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন: হুসাইনের মৃত্যুর ঘটনায় লোকেরা উল্লেখ করে থাকে যে, সে দিন কোনো পাথর উল্টালেই রক্ত বের হত, সে দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, আকাশের দিগন্ত লাল হয়ে গিয়েছিল এবং আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হয়েছিল। এসব কথা সন্দেহমূলক। প্রকৃতকথা হচ্ছে, এগুলো বিশেষ একটি গোষ্ঠীর বানোয়াট ও মিথ্যা কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা বিষয়টিকে বড় করার জন্য এগুলো রচনা করেছে। কোনো সন্দেহ নেই যে, কারবালার ময়দানে সপরিবারে হুসাইনের শাহাদাতবরণ একটি বিরাট ঘটনা। কিন্তু তারা এটিকে কেন্দ্র করে যে মিথ্যা রচনা করেছে, তার কোনটিই সংঘটিত হয় নি। ইসলামের ইতিহাসে হুসাইনের মৃত্যুর চেয়ে অধিক ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে সমস্ত ঘটনায় উপরোক্ত বিষয়গুলোর কোনটিই সংঘটিত হয় নি। হুসাইনের পিতা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্দুর রাহমান ইবন মুলজিম খারেজীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। সকল আলেমের ঐকমত্যে হুসাইনের চেয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু অধিক শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত ছিলেন। তার শাহাদাতের দিন কোনো পাথর উল্টালেই রক্ত বের হয় নি, সে দিন সূর্যগ্রহণ হয় নি, আকাশের

দিগন্ত লাল হয়ে যায় নি এবং আকাশ থেকে পাথরও বর্ষিত হওয়ারও কোনো প্রমাণ নেই। উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়ি ঘেরাও করে বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যা করে। তিনি মজলুম অবস্থায় শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে এসবের কোনটিই সংঘটিত হয় নি। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর পূর্বে খলীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনুল খাত্তাব ফজরের নামাযে দাঁড়ানোর সময় নির্মমভাবে নিহত হন। এই ঘটনায় মুসলিমগণ এমন মুসীবতে পড়েছিলেন, যা ইতোপূর্বে কখনও পড়েন নি। তাতে উপরোক্ত লক্ষণগুলো দেখা যায় নি। আল্লাহর সর্বশেষ্ঠ বান্দা সমগ্র নবী-রাসূলের সরদার রাহমাতুল লিল 'আলামীন মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে এমন কিছু সংঘটিত হয় নি। যেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিশু পুত্র ইবরাহীম মৃত্যুবরণ করেন, সেদিন সূর্যগ্রহণ লেগেছিল। লোকেরা বলতে লাগল: ইবরাহীমের মৃত্যুতে আজ সূর্যগ্রহণ হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্যগ্রহণের নামায আদায় করলেন এবং খুতবা প্রদান করলেন। খুতবায় তিনি বর্ণনা করলেন যে, সূর্য এবং চন্দ্র কারও মৃত্যু বা জন্ম গ্রহণের কারণে আলোহীন হয় না।

এগুলো আল্লাহর নিদর্শন। তিনি এগুলোর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখিয়ে থাকেন।

৬) হুসাইনের বের হওয়া ন্যায় সংগত ছিল কি?

বিজ্ঞ সাহাবীদের মতে কুফার উদ্দেশ্যে হুসাইনের বের হওয়াতে কল্যাণের কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় নি। এ জন্যই অনেক সাহাবী তাঁকে বের হতে নিষেধ করেছেন এবং তাঁকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি বিরত হন নি। কুফায় যাওয়ার কারণেই ঐ সমস্ত জালেম ও স্বৈরাচারেরা রাসূলের দৌহিত্রকে শহীদ করতে সক্ষম হয়েছিল। তার বের হওয়া এবং নিহত হওয়াতে যে পরিমাণ ফিতনা ও ফসাদ সৃষ্টি হয়েছিল, মদিনায় অবস্থান করলে তা হওয়ার ছিল না। কিন্তু মানুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহর নির্ধারিত ফয়সালা ও তকদীরের লিখন বাস্তবে পরিণত হওয়া ছাড়া ভিন্ন কোনো উপায় ছিল না। হুসাইনের হত্যায় বিরাট বড় অন্যায় সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু তা নবীদের হত্যার চেয়ে অধিক ভয়াবহ ছিল না। আল্লাহর নবী ইয়াহ-ইয়া আলাইহিস সালামকে পাপিষ্ঠরা হত্যা করেছে। জাকারিয়া আলাইহিস সালামকেও তাঁর জাতির লোকেরা নির্মমভাবে শহীদ

করেছে। এমনি আরও অনেক নবীকে বনী ইসরাইলরা কতল করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿قُلۡ قَدۡ جَآءَكُمۡ رُسُلٞ مِّن قَبۡلِي بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَبِٱلَّذِي قُلۡتُمۡ فَلِمَ قَتَلۡتُمُوهُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٨٣﴾ [ال عمران: ١٨٣]

“তুমি তাদের বলে দাও, তোমাদের মাঝে আমার পূর্বে বহু রসূল নিদর্শনসমূহ এবং তোমরা যা আবদার করেছ তা নিয়ে এসেছিলেন, তখন তোমরা কেন তাদেরকে হত্যা করলে যদি তোমরা সত্য হয়ে থাক।” (সূরা আলে-ইমরান: ১৮৩)

এমনভাবে উমর, উসমান ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকেও হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং তাঁর হত্যা কাণ্ড নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করার কোনো যুক্তি নেই।

৭) কারবালার ঘটনাকে আমরা কিভাবে মূল্যায়ন করব?

যে মুসলিম আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য হুসাইনের নিহত হওয়ার ঘটনা স্মরণ করে বিলাপ করা, শরীর জখম করা, গাল, মাথা ও বুক

থাবড়ানো বা এ রকম অন্য কিছু করা জায়েয নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«ليس منا من لطم الخدود و شق الجيوب»

"যে ব্যক্তি মুসীবতে পড়ে নিজ গালে চপেটাঘাত করল এবং শরীরের কাপড় ছিঁড়ল, সে আমাদের দলের নয়।" (বুখারী)

তিনি আরও বলেন: "মুসীবতে পড়ে বিলাপকারী, মাথা মুণ্ডনকারী এবং কাপড় ও শরীর কর্তনকারীর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

«إن النائحة إذا لم تتب فإنها تلبس يوم القيامة درعاً من جرب و سربالاً من قطران»

"মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপকারী যদি তওবা না করে মারা যায়, তাকে কিয়ামতের দিন খাঁজলীযুক্ত কোর্তা পরানো হবে এবং আলকাতরার প্রলেপ লাগানো পায়জামা পরানো হবে।" (মুসলিম)

তিনি আরও বলেন:

«أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب و الطعن في الأنساب و الاستسقاء بالنجوم و النياحة»

“আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলী যুগের চারটি স্বভাব বিদ্যমান রয়েছে। তারা তা ছাড়তে পারবে না। (১) বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব করা, (২) মানুষের বংশের নাম তুলে দুর্নাম করা, (৩) তারকারাজির মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা এবং (৪) মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা।

তিনি আরও বলেন:

“মানুষের মাঝে দুটি জিনিষ রয়েছে, যা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। মানুষের বংশের বদনাম করা এবং মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা।” (মুসলিম)

তিনি আরও বলেন:

«النياحة من أمر الجاهلية و إن النائحة إذا ماتت و لم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران و درعاً من لهب النار»

“মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা জাহেলিয়াতের অন্তর্ভুক্ত। বিলাপকারী যদি তওবা না করে মারা যায়, তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহ

আলকাতরার প্রলেপ লাগানো জামা পরাবেন এবং অগ্নি শিখা দ্বারা নির্মিত কোর্তা পরাবেন।” (ইবনে মাজাহ)

একজন বিবেকবান মুসলিমের উপর আবশ্যক হচ্ছে সে এ ধরণের মুসীবতের সময় আল্লাহর নির্দেশিত কথা বলবে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

﴿ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتۡهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيۡهِ رَٰجِعُونَ ١٥٦ ﴾ [البقرة: ١٥٦]

“যখন তাঁরা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।” (সূরা বাকারাঃ ১৫৬)

হুসাইনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলী ইবন হুসাইন, মুহাম্মাদ এবং জাফর জীবিত ছিলেন। তাদের কেউ হুসাইনের মৃত্যুতে মাতম করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তারা ছিলেন আমাদের হেদায়েতের ইমাম ও আদর্শ।

বিলাপ করা, গাল ও বুকে চপেটাঘাত করা বা এ জাতীয় অন্য কোনো কাজ কখনই ইবাদাত হতে পারে না। আশুরার দিনে

ক্রন্দনের ফযীলতে যে সমস্ত বর্ণনা উল্লেখ করা হয় তার কোনটিই বিশুদ্ধ নয়। বিলাপ করা জাহেলী জামানার আচরণ বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন।

৮) মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করার ক্ষেত্রে শিয়া মাজহাবের মতামত:

বিলাপ থেকে বিরত থাকার আদেশ শুধু সুন্নি মুসলিম বা বনী উমাইয়াদের জন্য নয় কিংবা এটি কেবল তাদেরই আচরণ নয় যে, শিয়ারা তা গ্রহণ করতে পারেন না; বরং আহলে বাইতের কথাও তাই। আহলে সুন্নত এবং শিয়া উভয় শ্রেণীর নিকটই মৃত ব্যক্তির উপর বিলাপ করা নিষিদ্ধ।

শিয়া আলেম ইবনে বাবুওয়াই আল-কুম্মী বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

বিলাপ করা জাহেলী জামানার কাজ। (দেখুন শিয়াদের কিতাব: من لا يحضره الفقيه)

মাজলেসী থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে,

النياحة عمل الجاهلية

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির উপর উচ্চ স্বরে রোদন করা জাহেলিয়াতের কাজ। (দেখুন: বিহারুল আনওয়ার ১০/৮২)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ধরণের নিষেধাজ্ঞার কারণেই আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা যে কোনো মুসীবতের সময় মাতম ও বিলাপ করা থেকে বিরত থাকেন।

৯) আশুরার দিনে আমাদের করণীয় কীঃ

সুন্নি মুসলিমগণ এই দিনে রোযা রাখেন। কারণ এটি এমন একটি দিন যাতে আল্লাহ তা'আলা মুসা ও তাঁর জাতির লোকদেরকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফেরাউন সম্প্রদায়কে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের লোকেরা মনে করেন, খালেস দিলে রোযা অবস্থায় হুসাইনের জন্য দো'আ করা জাহেলী জামানার আচরণের মত মাতম ও বিলাপ করার চেয়ে অনেক উত্তম। এ দিনে রোযাদারের জন্য দুটি কল্যাণ রয়েছে। একটি হচ্ছে সম্মানিত দিনে রোযা রাখার ফযিলত আর অন্যটি হচ্ছে,

রোযা অবস্থায় দো'আ করার ফযিলত। এই দো'আর একটি অংশ বা সম্পূর্ণটাই তিনি ইচ্ছা করলে হুসাইনের জন্য করতে পারেন।

আশুরার দিনে রোযা রাখার ফযীলতে যা বর্ণিত হয়েছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمًا يَعْنِي عَاشُورَاءَ فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ فَصَامَ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ فَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

"আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করে দেখলেন ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এটি কোনো রোযা। তারা উত্তর দিল যে, এটি একটি বিরাট পবিত্র দিন। এদিনে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলকে তাদের শত্রুদের কবল থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। তাই মুসা আলাইহিস সালাম এ দিন রোযা রেখেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন: তাদের চেয়ে মুসা আলাইহিস সালামের সাথে আমার সম্পর্ক অধিক।

সুতরাং তিনি রোযা রাখলেন এবং সাহাবীদেরকে রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন।” (বুখারী)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيضَةَ وَتُرِكَ عَاشُورَاءُ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصُمْهُ (بخارى)

“আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: আইয়ামে জাহেলিয়াতেও কুরাইশরা আশুরার রোযা রাখত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামও এ দিনে রোযা রাখতেন। মদিনায় হিজরত করে এসেও তিনি এ দিন রোযা রেখেছেন এবং লোকদেরকে রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন। যখন রমাযানের রোযা রাখা ফরয করা হল তখন আশুরার রোযা ছেড়ে দিলেন। সুতরাং তখন থেকে যার ইচ্ছা রোযা রাখত আর যার ইচ্ছা রোযা রাখা ছেড়ে দিত।” (বুখারী) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে,

حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আশুরার রোযা রাখলেন এবং রোযা রাখার আদেশ দিলেন, তখন সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এটি তো এমন একটি দিন, যাতে ইয়াহুদ-নাসারারাও সম্মান করে। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: আগামী বছর ইনশা-আল্লাহ্ নয় তারিখেও রোযা রাখবো। কিন্তু আগামী বছর আসার আগেই তিনি মারা যান। (বুখারী)

১০) শিয়াদের বর্ণনায় আশুরার রোযা:

আলী ইবন আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

صوموا عاشوراء ، التاسع والعاشر ، فإنّه يكفّر الذنوب سنة

তোমরা আশুরার অর্থাৎ নয় এবং দশ তারিখে রোযা রাখো। কেননা ইহা পূর্বের এক বছরের গুনাহকে মোচন করে দেয়। (দেখুন: (৭/৩৩৭الحر العاملي في وسائل الشيعة) ২/১৩৪الاستبصار জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আশুরার রোযা এক বছরের গুনাহর কাফফারা স্বরূপ।

১১) আশুরার দিনে মাতম করার ভিত্তি কোথায়?

বর্তমানে আশুরার দিনে হুসাইনীয়াত নামে যে অনুষ্ঠান, মাতম, বুক ও গাল থাপড়ানো, উচ্চ স্বরে ক্রন্দন এবং বিলাপ করে থাকে তার কোনো ভিত্তি নেই। আহলে বাইতের নামে প্রচলিত মাজহাবেও তার কোনো দলীল নেই এবং সর্বোপরি ইসলামী আকীদার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। শিয়ারা যেহেতু বলে থাকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যা হালাল করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত তা ছাড়া অন্য কিছু হালাল নয় এবং তিনি যা হারাম করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত তা ছাড়া অন্য কিছু হারাম নেই সেহেতু তাদের কাছে প্রশ্ন হল: আপনারা যদি উপরোক্ত কথাটি বিশ্বাস করেন তাহলে বাক্যটির বাস্তবায়ন কোথায়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক

নিষিদ্ধ জাহেলী জামানার একটি অভ্যাসকে আপনারা ইসলাম ও আহলে বাইতের নিদর্শন নির্ধারণ করেছেন কেন?

আশ্চর্যের কথা হচ্ছে তাদের মোল্লা-মুন্সীরা আশুরার দিনে মাতম ও হায় হুসাইন হায় হুসাইন বলে চিৎকার করাকে আল্লাহর নিদর্শন বলে উল্লেখ করে নিম্নের আয়াতটিকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ ذَٰلِكَۖ وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ ٣٢ ﴾ [الحج: ٣٢]

"এটা। আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে তা তো তার হৃদয়ের তাকওয়াপ্রসূত। (সূরা হজ্জ: ৩২)

অতএব তারা বিলাপ করা, গাল ও বুক থাপড়ানো, আল্লাহর বান্দা ও রাসূলের সাহাবীদেরকে গালাগালি করাকে আল্লাহর সম্মানিত নিদর্শন মনে করেই করে থাকেন। এর চেয়ে অধিক মূর্খতা আর কি হতে পারে?

আরও আশ্চর্যের কথা হচ্ছে আশুরার রোযার ব্যাপারে সুস্পষ্ট হাদীছ থাকা সত্ত্বেও এগুলোকে তারা জেনেও না জানার ভান করে থাকেন।

অপর পক্ষে তাদের আলেমগণ এই বর্ণনাগুলোকে বারবার আহ্লে সুন্নত ও বনী উমাইয়াদের বানানো বলে অপবাদ দিয়ে থাকেন। তারা আরও বলেন যে, বনী উমাইয়াগণ হুসাইনের মৃত্যু উপলক্ষে অনুষ্ঠান করার জন্য এই রোযার প্রচলন করেছেন। (নাউযুবিল্লাহ্) অথচ সুন্নি ও শিয়া উভয় মাজহাবের হাদীছের কিতাবেই এই রোযার ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁর পবিত্র পরিবার এবং সাহাবীগণ আশুরার রোযা রেখেছেন। তিনি মুসলিমদেরকে রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন।

এখন তাদের কাছে প্রশ্ন হল: যে ব্যক্তি আশুরার দিনে রোযা রেখে, জিকির-আজকার করে, কুরআন তেলাওয়াত করে এবং অন্যান্য ইবাদাতের মাধ্যমে এই দিন অতিবাহিত করে সে হুসাইনের মৃত্যুতে আনন্দের অনুষ্ঠান করল? না যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে গোশত, খাদ্য-পানীয় এবং অন্যান্য বস্তু বিতরণ করল এবং বিভিন্ন শির্কী কবিতা আবৃতি করে রাত পার করে দিল সে হুসাইনের মৃত্যু উদযাপন করল? মূলত তাদের কথার মধ্যে সুস্পষ্ট স্ববিরোধীতা রয়েছে।

১২) হুসাইনের হত্যায় ইয়াযীদ কতটুকু দায়ী?

প্রথমেই বলে নিতে চাই যে আমার এই কথা ইয়াযীদের পক্ষে উকালতি করার জন্য নয়; বরং মূল সত্যকে বিশ্বের সকল বাংলাভাষী মুসলিমের সামনে তুলে ধরার জন্যে। **শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন:** সকল মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকের ঐকমত্যে ইয়াযীদ ইবন মু'আওয়িয়া হুসাইনকে হত্যার আদেন দেন নি। বরং তিনি উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদকে চিঠির মাধ্যমে আদেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন ইরাকের জমিনে হুসাইনকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বাঁধা দেন। এতটুকুই ছিল তার ভূমিকা। বিশুদ্ধ মতে তার কাছে যখন হুসাইন নিহত হওয়ার খবর পৌঁছল তখন তিনি আফসোস করেছেন। ইয়াযীদের বাড়িতে কান্নার ছাপ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি হুসাইন পরিবারের কোনো মহিলাকে বন্দী বা দাসীতে পরিণত করেন নি; বরং পরিবারের সকল সদস্যকে সম্মান করেছেন। সসম্মানে হুসাইন পরিবারের জীবিত সদস্যদেরকে মদিনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন।

যে সমস্ত বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ইয়াযীদ আহলে বাইতের মহিলাদেরকে অপদস্থ করেছেন এবং তাদেরকে বন্দী করে দামেস্কে নিয়ে বেইজ্জতি করেছেন, তার কোনো ভিত্তি নেই। বনী উমাইয়াগণ

বনী হাশেমকে খুব সম্মান করতেন। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ যখন ফাতেমা বিনতে আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফরকে বিয়ে করলেন তখন আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান এই বিয়ে মেনে নেন নি। তিনি হাজ্জাজকে বিয়ে বিচ্ছিন্ন করার আদেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয় হুসাইন হত্যার জন্য দায়ী উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের কাছে যখন হুসাইনের পরিবারের মহিলাদেরকে উপস্থিত করা হল তখন তিনি আলাদাভাবে তাদের জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করলেন এবং তাদের ভরণ-পোষণ ও পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করলেন। (ইবনে জারীর হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন)

ঐতিহাসিক ইজ্জত দাররুযা বলেন: হুসাইন হত্যার জন্য ইয়াযীদকে সরাসরি দায়ী করার কোনো দলীল নেই। তিনি তাঁকে হত্যার আদেশ দেন নি। তিনি যেই আদেশ দিয়েছেন, তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে, তাঁকে ঘেরাও করা হোক এবং তিনি যতক্ষণ যুদ্ধ না করবেন ততক্ষণ যেন তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করা হয়। ইমাম ইবনে কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন: এটি প্রায় নিশ্চিত যে ইয়াযীদ যদি হুসাইনকে জীবিত পেতেন, তাহলে তাঁকে হত্যা করতেন না। তাঁর পিতা মু'আওয়িয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে এ মর্মে

অসীয়তও করেছিলেন। ইয়াযীদ এই কথাটি সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছিলেন।

১৩) তাহলে কে হুসাইনকে হত্যা করল:

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কে হুসাইনকে হত্যা করল। সুন্নি মুসলিমগণ? আমীর মু'আওয়িয়া? ইয়াযীদ ইবন মু'আওয়িয়া? না অন্য কেউ?

উত্তরটি মেনে নেওয়া অনেক মুসলিমের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হলেও তা প্রকাশ না করে পারছি না। প্রকৃত ও সঠিক তথ্য হল শিয়াদের একাধিক কিতাব বলছে যে, শিয়ারাই (ইরাকবাসীরাই) হুসাইনকে হত্যা করেছে।

সায়্যেদ মুহসিন আল-আমীন বলেন: বিশ হাজার ইরাকবাসী হুসাইনের পক্ষে বাই'আত নেয়। পরবর্তীতে তারা তাঁর সাথে খেয়ানত করেছে, তাঁর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছে এবং তাঁকে হত্যা করেছে। (দেখুন: আ'ইয়ানুশ শিয়া ১/৩৪)

১৪) হুসাইনের হত্যাকারী নির্ধারণে ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিমত:

ইবনে আবী নু'ম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন:

كُنْتُ شَاهِدًا لاِبْنِ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ . قَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُنِى عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هُمَا رَيْحَانَتَاىَ مِنَ الدُّنْيَا

আমি একদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন একজন লোক তাঁকে ইহরাম অবস্থায় মশা হত্যা করার হুকুম জানতে চাইল। তিনি তখন লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি কোনো দেশের লোক? সে বলল: ইরাকের। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: তোমরা এই লোকটির প্রতি লক্ষ্য কর। সে আমাকে মশা হত্যা করার হুকুম জিজ্ঞেস করছে। অথচ তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতিকে হত্যা করেছে। আর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, এরা দুজন (হাসান ও হুসাইন) আমার দুনিয়ার দুটি ফুল। (বুখারী, হাদীছ নং- ৫৯৯৪)

অন্য বর্ণনায় মশার স্থলে মাছির কথা এসেছে।

১৫) হুসাইনের ভাষণই প্রমাণ করে যে ইয়াযীদ তাঁর হত্যার জন্য সরাসরি দায়ী নয়:

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু নিহত হওয়ার পূর্বে ইরাকবাসীদেরকে ডেকে বলেছেন: তোমরা কি পত্রের মাধ্যমে আমাকে এখানে আসতে আহবান করো নি? আমাকে সাহায্য করার ওয়াদা করো নি? অকল্যাণ হোক তোমাদের! যেই অস্ত্র দিয়ে আমরা ও তোমরা মিলে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি এখন সেই অস্ত্র তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে চালাতে যাচ্ছ। মাছি যেমন উড়ে যায় তেমনি তোমরা আমার পক্ষে কৃত বাই'আত থেকে সরে যাচ্ছ, পোঁকা-মাকড়ের ন্যায় তোমরা উড়ে যাচ্ছ এবং সকল ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ। ধ্বংস হোক এই উম্মতের তাগুতের দলেরা! (দেখুন, শিয়া লেখক তাবারসী এর 'আল-ইহতেজাজ')

ইমাম হুসাইনের এই ভাষণের কোনো স্থানেই তিনি ইয়াযীদকে দায়ী করেন নি। ঘুরেফিরে ভাষণটি এই কথার প্রমাণ করে যে, তাঁর করুন পরিস্থিতির জন্য ইরাকবাসীগণই।

অতঃপর হুর ইবন ইয়াযীদ নামক হুসাইনের একজন সমর্থক কারবালার প্রান্তরে দাড়িয়ে ইরাকবাসী সৈনিকদেরকে ডাক দিয়ে বললেন: তোমরা কি এই নেককার বান্দাকে এখানে আসতে আহবান করো নি? তিনি যখন তোমাদের কাছে এসেছেন তখন তোমরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছ এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়েছ। আর তিনি এখন তোমাদের হাতে বন্দী হয়েছেন। আল্লাহ যেন কিয়ামতের দিন তোমাদের পিপাসা না মেটান এবং তার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন! (দেখুন: الإرشاد للمفيد ২৩৪ ، إعلام الورى بأعلام الهدى)

এই পর্যায়ে হুসাইন তাঁর পূর্বের সমর্থকদের বিরুদ্ধে একটি বদদো‘আ করলেন। তিনি বলেন:

اللّٰهُمَّ إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقاً أي شيعاً وأحزاباً واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا ، فإنهم دعونا لينصرونا ، ثم عدوا علينا فقتلونا)

انظر الإرشاد للمفيد ٢٤١، إعلام الورى للطبرسي ٩٤٩، كشف الغمة ٢/١٨، و٣٨.

"হে আল্লাহ! আপনি যদি তাদের হায়াত দীর্ঘ করেন, তাহলে তাদের দলের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে দিন। তাদেরকে দলে দলে বিচ্ছিন্ন করে দিন। তাদের শাসকদেরকে তাদের উপর কখনই সন্তুষ্ট করবেন না। তারা আমাদেরকে সাহায্য করবে বলে ডেকে এনেছে। অতঃপর আমাদেরকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়েছে। হুসাইনের এই দো'আ প্রমাণ করে যে, ইয়াযীদ প্রত্যক্ষভাবে হুসাইনের হত্যায় জড়িত ছিল না। কেননা তিনি দো'আয় বলেছেন: হে আল্লাহ! আপনি তাদের শাসকদেরকে তাদের উপর কখনই সন্তুষ্ট করবেন না। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, ইরাকবাসীগণ (শিয়াগণ) উমাইয়া শাসকদের সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় হুসাইনের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে এবং তাঁর সাথে খেয়ানত করেছে। বাস্তবে তাই হয়েছে। পরবর্তীতে উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদকেও নির্মম ও নিকৃষ্টভাবে হত্যা করা হয়েছে।

১৬) আলী ইবন হুসাইন তাঁর পিতা হুসাইনকে হত্যার জন্য কুফাবাসীদেরকে দায়ী করেছেন?

শিয়া ঐতিহাসিক ইয়া‘কুবী বলেন: আলী ইবন হুসাইন যখন কুফায় প্রবেশ করলেন তখন দেখলেন কুফার মহিলারা হুসাইন হত্যার বেদনায় ক্রন্দন এবং বিলাপ করছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এরা কি আমাদের হত্যায় বিলাপ করছে? তাহলে আমাদেরকে হত্যা করল কে? অর্থাৎ তারা ব্যতীত আমাদের পরিবারের লোক ও আত্মীয়দেরকে অন্য কেউ হত্যা করে নি (দেখুন: তারিখে ইয়া‘কুবী ১/২৩৫)

উপরে বর্ণিত পৃষ্ঠা নাম্বারসহ তাদের কিতাবগুলোর তথ্য প্রমাণ করে যে, যারা নিজেদেরকে হুসাইনের সমর্থক ও প্রেমিক বলে দাবী করেন, তারাই তাঁকে হত্যা করেছেন। অতঃপর এই মারাত্মক অপরাধের জ্বালা অন্তর থেকে দূর করার জন্য তারাই পরবর্তীতে কেঁদে বুক ভাসিয়েছেন এবং যাদের কান্না আসে নি, তারাও অযথা কান্নার ভান করেছেন। এই খেলা-তামাশা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে

এবং এখনও চলছে। তাদের অনুসারীরা এখনও হুসাইনের জানাযা বহন করছেন।

হুসাইনের মৃত্যুতে রোদন করা যদি আহলে বাইতের প্রতি তাদের প্রকৃত ভালবাসার প্রমাণ হয়, তাহলে হুসাইনের প্রতি তাদের ভালবাসা সত্য হলে তারা হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুতে রোদন করে না কেন?

হুসাইনের উপর তাদের এই কান্না যদি আহলে বাইতের প্রতি অগাধ ভালবাসার কারণেই হত, তাহলে শহীদদের সরদার রাসূলের চাচা হামযাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুতে তারা ক্রন্দন করে না কেন? তাঁকে যে নির্মমভাবে ও পাশবিকতার হত্যা করা হয়েছে, হুসাইন হত্যার পাশবিকতার চেয়ে তা কোনো অংশে কম নয়। সায়্যেদ হামযাহকে হত্যা করে তাঁর পেট চিরে কলিজা বের করা হয়েছে। তারা কেন এই হত্যাকাণ্ডের জন্য বাৎসরিক মাতম করে না? তাদের বুক ও চেহারায় আঘাত করে না কেন? কাপড় টেনে ছিঁড়ে না কেন? প্রতি বছর যখন উহুদ যুদ্ধের দিন ও তারিখ আসে তখন তলোয়ার খেলায় মেতে উঠে না কেন? সায়্যেদ হামযাহ কি আহলে বাইতের একজন সম্মানিত সদস্য নন? এখানেই শেষ নয়; রাসূলের মৃত্যুর

চেয়ে অধিক বড় কোনো মুসীবত আছে কি? তাঁর মৃত্যুতে তাদের ক্রন্দন ও মাতম কোথায়? সচেতন পাঠকদেরকেই এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে নিতে হবে এবং কারও আকীদায় ত্রুটি থাকলে লেখাটি পড়েই তা সংশোধন করে নিতে হবে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, তাদের কাছে হুসাইনই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কি কারণে তাদের কাছে এত প্রিয়? উত্তর পূর্বে উল্লেখ করেছি। সেটিই আসল কারণ? না ইমাম হুসাইন কর্তৃক একজন পারস্য মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন, তাই এত ভালবাসা? উভয়টিই এর কারণ হতে মানা কোথায়? হুসাইন ও তাঁর পিতা আলী ইবন আবু তালিব সম্পর্কে তাদের অন্যান্য আকীদাহ-বিশ্বাসের দিকে না গিয়ে এখানেই ছেড়ে দিলাম।

১৭) হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাথা কোথায় গিয়েছিল?

দামেস্কে ইয়াযীদের দরবারে হুসাইনের মাথা প্রেরণের বর্ণনা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয় নি। বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, তিনি কারবালার প্রান্তরে শহীদ হয়েছেন। তাঁর সম্মানিত মাথা কুফার গভর্নর উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়।

আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: হুসাইনের মাথা উবাইদুল্লাহ এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি তাঁর মাথাকে একটি থালার মধ্যে রেখে একটি কাঠি হাতে নিয়ে তা নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন এবং তাঁর সৌন্দর্য দেখে সম্ভবত বেখেয়ালে কিছুটা বর্ণনাও করে ফেলেছিলেন। হাদীছের শেষের দিকে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সবচেয়ে বেশী সাদৃশ্যপূর্ণ। (বুখারী)

অন্য বর্ণনায় আছে, আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি উবাইদুল্লাহকে বললাম, তোমার হাতের কাঠি হুসাইনের মাথা থেকে উঠিয়ে ফেল। কারণ আমি তোমার কাঠি রাখার স্থানে রাসূলের পবিত্র মুখ দিয়ে চুমু খেতে দেখেছি। এতে কাঠি সংকোচিত হয়ে গেল। (দেখুন: ফতহুল বারী ৭/৯৬)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এরপর কোথায় হুসাইনের কবর হয়েছে এবং তাঁর মাথা কোথায় গিয়েছে, তা সঠিক সূত্রের মাধ্যমে জানা যায় নি। প্রকৃত ও সঠিক জ্ঞান আল্লাহর নিকটেই।

১৮) যেমন কর্ম তেমন ফল:

পরবর্তীতে আল-আশতার নাখ‘য়ীর হাতে উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদ নির্মমভাবে নিহত হন। যখন নিহত হলেন তখন তার মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মসজিদে রাখা হল। তখন দেখা গেল একটি সাপ এসে মাথার চারপাশে ঘুরছে। পরিশেষে উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে মুখ দিয়ে বের হল। ফের মুখ দিয়ে প্রবেশ করে নাকের ছিদ্র দিয়ে তিনবার বের হতে দেখা গেল। (দেখুন: তিরমিযী, ইয়াকুব ইবন সুফীয়ান)

১৯) ইয়াযীদ সম্পর্কে একজন মুসলিমের ধারণা কেমন হওয়া উচিত:

তাফসীর, হাদীছ, আকীদা, এবং ইতিহাস ও জীবনীর কিতাবগুলো অধ্যয়ন করে যতদূর জানতে পেরেছি, তাতে দেখা যায় সালাফে সালেহীনের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং অনুকরণীয় কোনো ইমামের কিতাবে ইয়াযীদের উপর লা‘নত করা বৈধ হওয়ার কথা আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি। কেউ তার নামের শেষে রাহিমাহুল্লাহ বা লা‘আনা হুল্লাহ- এ দু’টি বাক্যের কোনোটিই উল্লেখ করেন নি।

সুতরাং তিনি যেহেতু তার আমল নিয়ে চলে গেছেন, তাই তার ব্যাপারে আমাদের জবান দরাজ করা ঠিক নয়। তাকে গালাগালি করাতে আমাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু অর্জিত হবে না। তার আমল নিয়ে তিনি চলে গেছেন। আমাদের আমলের হিসাব আমাদেরকেই দিতে হবে। তার ভাল মন্দ আমলের হিসাব তিনিই দিবেন। **ইমাম যাহাবী ইয়াযীদের ব্যাপারে বলেন:**

لا نسبه ولا نحبه

অর্থাৎ "আমরা তাকে গালি দিবো না এবং ভালও বাসবো না।" মদ পান করা, বানর নিয়ে খেলা করা, ফাহেশা কাজ করা এবং আরও যে সমস্ত পাপ কাজের অপবাদ ইয়াযীদের প্রতি দেওয়া হয়, তা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। তবে তাঁর চেয়ে হুসাইন যে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সুতরাং ইয়াযীদ মুসলিম ছিলেন। তার জীবনের শেষ মুহূর্তে আমরা যেহেতু উপস্থিত ছিলাম না, তাই তার ব্যাপারটি আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়াই অধিক নিরাপদ। তা ছাড়া বুখারী শরীফের একটি হাদীছে তার ক্ষমা পাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে আছে যে,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমার উম্মতের একটি দল কুস্তুনতীনিয়ায় (কনস্টান্টিনোপল) যুদ্ধ করবে তাদেরকে ক্ষমা করা দেওয়া হবে। জানা যাচ্ছে, ইয়াযীদ ইবন মু'আওয়িয়া ছিলেন সেই যুদ্ধের সেনাপতি। আর হুসাইন তাতে সাধারণ সৈনিক হিসেবে শরীক ছিলেন। সুতরাং ইয়াযীদও ক্ষমায় শামিল হতে পারে। আল্লাহই ভাল জানেন।

২০) উপসংহার:

হুসাইনের মৃত্যু নিয়ে লোকেরা তিনভাগে বিভক্ত:

একদলের মতে, তিনি অন্যায়ভাবে মুসলিমদের ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য ইয়াযীদের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তাই তাঁকে হত্যা করা সঠিক ছিল। তারা বুখারী শরীফের এই হাদীছ দিয়ে দলীল দেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه»

“একজন শাসকের সাথে তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যদি তোমাদের জামা‘আতে বিভক্তি সৃষ্টির জন্য কেউ আগমন করে তবে তাকে হত্যা করো।” (বুখারী) তারা বলেন: মুসলিমরা ইয়াযীদের শাসনের উপর ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। হুসাইন এসে সেই ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করেছেন। সুতরাং তাঁকে হত্যা করা যুক্তিসংগত হয়েছে।

অন্যদল মনে করেন হুসাইনই ছিলেন খেলাফতের একমাত্র হকদার। তাঁর আনুগত্য করা ব্যতীত অন্য কারও অনুসরণ করা বৈধ ছিল না। জামা‘আত, জুমআসহ ইসলামের কোনো কাজই তাঁর পিছনে বা তাঁর নিয়োগ কৃত প্রতিনিধি ছাড়া অন্য কারও অনুসরণ করে সম্পাদন করলে তা বাতিল হবে। এমন কি তাঁর অনুমতি ব্যতীত শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাও বৈধ ছিল না। এমনি আরও অনেক কথা। এই দলের কথার সমর্থনে কোনো সুস্পষ্ট দলীল খুঁজে পাওয়া যায় নি।

আর উপরোক্ত উভয় দলের মাঝখানে হচ্ছে আহলে সুন্নত ওয়াল জামআতের মাজহাব। তাঁরা উপরের দুটি মতের কোনটিকেই সমর্থন

করেন না। বরং তাঁরা বলেন: হুসাইন মজলুম ও শহীদ অবস্থায় নিহত হয়েছেন। তিনি মুসলিম জাতির নির্বাচিত আমীর বা খলীফা ছিলেন না। সুতরাং দ্বিতীয় মতের পোষণকারীদের কথা ঠিক নয়।

আর যারা বুখারী শরীফের হাদিছকে দলীল হিসেবে পেশ করে হুসাইনকে হত্যা করা বৈধ হওয়ার কথা বলে থাকেন তাদের দলীল গ্রহণ সঠিক নয়। হাদীছ কোনোভাবেই তাদের কথাকে সমর্থন করে না। কারণ তিনি যখন তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম ইবন আকীলের চিঠি পেলেন তখন খেলাফতের দাবী ছেড়ে দিয়ে ইয়াযীদের সৈনিকদের কাছে তিনটি প্রস্তাব পেশ করেছেন:

• সিরিয়ায় গিয়ে তাঁকে ইয়াযীদের সাথে সাক্ষাত করতে দেওয়া হোক।

• অথবা তাকে মুসলিম রাজ্যের কোনো সীমান্তের দিকে যেতে দেওয়া হোক।

• অথবা তাঁকে মদিনায় ফেরত যেতে দেওয়া হোক। কিন্তু তারা কোনো প্রস্তাবই মেনে নেয় নি। বরং তারা তাঁকে আত্মসমর্পণ করে তাদের হাতে বন্দী হওয়ার প্রস্তাব করল। অস্ত্র

ফেলে দিয়ে তাদের পাল্টা প্রস্তাব মেনে নেওয়া হুসাইনের উপর মোটেই ওয়াজিব ছিল না। সুতরাং তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করাকেই বেছে নিলেন এবং ইয়াযীদের বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করে শাহাদাত বরণ করলেন।

পরিশেষে বলতে চাই যে, হুসাইনের মৃত্যু ও কারবালার ঘটনা নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা কোনো মুসলিমের কাজ হতে পারে না। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে অন্যান্য মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড থেকে আলাদা কোনো ঘটনা নয়। এ জাতীয় সকল ঘটনাকে সমানভাবে মূল্যায়ন করা উচিত। বিষাদসিন্ধু মুসলিমদের কোনো মূলনীতির গ্রন্থ নয়। এটি একটি কাল্পনিক উপন্যাস মাত্র। তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম জাতি ঐতিহাসিকভাবে একটি প্রমাণিত সত্যকে বাদ দিয়ে কাল্পনিক কাহিনীকে কখনই সত্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না।

هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

রচনায়: শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী

লিসান্স: মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম,এম, ফাস্ট ক্লাশ

জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সৌদী আরব।

ashahed1975@gmail.com

সূত্র : সালাফী বিডি